বিদ্যাসাগর ও প্রান্তবাসী

সারসংক্ষেপ

মৃত্যু একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। জীবন ও মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন ও তার বেঁচে থাকাটা আশ্চর্যের হলেও জীবন নিয়ে মানুষ যত না ভেবেছে তার কয়েকশগুণ বেশি ভেবেছে মৃত্যু নিয়ে। জীবনসায়াহ্নে এসে মানুষ সাধারণত কর্মবিমুখ হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন কর্মযোগী। তাঁর জীবনের একটিই ব্রত- কীভাবে শোষিত, লাঞ্ছিত এবং প্রান্তিক মানুষ একটু ভাল থাকবে, বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে রত রেখেছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন খুব একটা সুখের হয়নি। নাগরিক জীবনের প্রতি একটা সময় বিদ্যাসাগরের বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তিনি তাঁর কাছের ও দূরের মানুষের দ্বারা ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকেন। তথাকথিত সভ্য নাগরিক সমাজ পরিত্যাগ করে জীবনের শেষ লগ্নে তিনি চলে গিয়েছিলেন বর্তমান ঝাড়খণ্ডের এক অখ্যাত গ্রাম কার্মাটাঁড়ে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শেষ আঠারোটি বসন্ত কার্মাটাঁড়েপ্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে কাটান। তিনি সেখানে কীভাবে জীবন কাটাতেন? কারা ছিল তাঁর অন্তিমের সঙ্গী? এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের কার্মাটাঁড়েপ্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে কাটানো বিস্মৃতপ্রায় জীবনের অজানা নানা ঘটনার আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: কার্মাটাঁড়, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নন্দনকানন, দাতব্য চিকিৎসা, মহাসাগর, জঙ্গলমহল।

লেখক

ড. গৌতম দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
কুশমণ্ডি সরকারি মহাবিদ্যালয়, কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
goutamdaa2015@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি জীবনের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। কারুণাঘন বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রায় ৭০ বছরের জীবন পর্বের ১৮ বছর কেটেছিল 'কার্মাটাঁড়' অঞ্চলে। জামতাড়া ও মধুপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলস্টেশনের নাম 'কার্মাটাঁড়'। 'কার্মাটাঁড়' শব্দকে ভাঙলে তার অর্থ পাওয়া যাবে। 'কর্মা' ও 'টাঁড়' শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে- 'করমা' নামে একজন সাঁওতাল মাঝি (প্রধান) ছিলেন, যিনি 'টাঁড়' মানে উঁচু জমিতে বাস করতেন। বন্যার কবল থেকে বাঁচবার জন্য উঁচু জমিতে বসবাস। অধুনা 'কার্মাটাঁড়' ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখছেন, ""কার্মাটাঁড়" শব্দের অর্থ করমা নামে একজন সাঁওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাঁড় অর্থাৎ উঁচু জমি বন্যায় ডুবিয়া যায়না। এখন কার্মাটাঁড়ে একটি ই.আই.আর লাইনের এই ষ্টেশন হইয়াছে। উহা জামতারা ও মধুপুর ষ্টেশনের মধ্যে।"[১]-এখন বর্তমানে 'কার্মাটাঁড়' রেলস্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে 'বিদ্যাসাগরের' নামে। বিদ্যাসাগর স্টেশনের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরানো। স্টেশনের ২ নং প্ল্যাটফর্মেরমাঝামাঝি একটি শ্বেতপাথরের ফলক স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবন-পত্রী প্রতিফলিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কার্মাটাঁড়ে' বাড়ি কিনলেও তাকে মনের মতো করে গড়ে তুলে বসবাস শুরু করে ছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সন্তোষ কুমার অধিকারী 'বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা' গ্রন্থে লিখেছেন-'অত্যন্ত নির্জন ও স্বাস্থ্যকর একটি স্থান তিনি পেয়েছিলেন- বিহারের কার্মাটাঁড়ে। ১৮৭৩-'৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্মাটাঁড়ে জমি কিনে, নিজের বাসের জন্য বাংলো বাড়ি তৈরি করেন।' বাড়িটির নাম রেখেছিলেন 'নন্দনকানন'। নন্দনকাননের মধ্যে ১১টি ঘর আছে। বাংলোর চারপাশে চারচৌকশ জমিতে বাগান। বাগানে লতানো আমগাছের চারা তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন। দেবারতি মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "বাড়িটার বাঁদিকে একখানা মস্ত আমগাছ। এত বড় যে, গোটা জায়গাটার ওপর যেন ছাতা ধরে অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।"[২]- বিদ্যাসাগর নিজে পরমযত্নে গাছগুলোকে প্রতিপালন করতেন। বাগানে আরও নানারকমের গাছ ছিল। কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সময় তিনি কখনো অলস জীবনযাত্রায় সময় কাটান নি। এখানে অশক্ত শরীর নিয়েও তিনি নানারকম জনসেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ ১৮ বছরের নাজানা কথা, যা জানা যায়, তা অবশ্যই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তের ইতিহাসে বিরল। শহরবাসী মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদীদের সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, তিনি কলকাতা শহর ছেড়ে সাঁওতালদের সাম্রাজ্যে স্থান নিয়েছিলেন।

ইংরেজ শাসক ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরবের নেতৃত্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, তাতে প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতালের প্রাণ গিয়েছিল। অনেক ইতিহাসবিদের মতে এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন। সংগ্রামী সাঁওতালদের ইংরেজ সেনাবাহিনী হত্যা করে বীরভূমের 'দিগুলির' পুকুরে ফেলে দেয়। পুকুরটি 'সাঁওতাল কাটা' পুকুর নামে খ্যাত হয়েছে। সিউড়ির রেলস্টেশন সংলগ্ন কেঁন্দুয়া জঙ্গলে সাঁওতাল সংগ্রামীদের গণকবর দিয়ে ইংরেজ সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করে। তারপরেই শাসক ইংরেজ সরকার, বৃহত্তর বীরভূমকে 'সাঁওতাল পরগণা' নামে স্বতন্ত্র জেলায় ভাগ করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাঁওতাল পরগণার কার্মাটাঁড়ে আসেন। তখন সদ্য সাঁওতাল বিদ্রোহে বিধ্বস্ত হয়েছে জঙ্গলমহল। অবহেলিত, বঞ্চিত সাঁওতালদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে চরম অবহেলায়। সেই অবহেলিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সাঁওতাল দেশে বিদ্যাসাগর এসে, তাদের উন্নয়নে ভরিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে সুখরঞ্জন মিদ্দে লিখছেন, "সাঁওতাল পরগণার কার্মাটাঁড়ে দীর্ঘ ১৮ বছর থাকার সময়, দয়ারসাগর সাঁওতাল জনজাতিকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন, সাঁওতালদের সঙ্গে

কথা বলে আমার আনন্দ হয়। ওরা গালি দিলে আমার তৃপ্তি লাগে। ওরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু ওরা সহজ-সরল-অকৃত্রিম-আন্তরিক।"[৩]

মিহিজাম, দেওঘর, শিমুলতলা, ঝাঝা, কার্মাটাঁড় প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যাসাগর ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ সাঁওতালদের সেবা করেছিলেন। তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিলেন। রক্তমাংসের দেবতা বিদ্যাসাগর, সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দরিদ্র দুঃস্থ ও আর্ত অসুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্বল-পীড়িত মানুষের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁড়ে যে গৃহটি বিদ্যাসাগর নির্মাণ কাবেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'নন্দনকানন'। নামটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হয়েছিল। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। শাল-শিমুল-পলাশ-মহুয়ার ফুলে সজ্জিত ছিল। খোলা সবুজ প্রান্তর দিয়ে সশব্দে শুদ্ধ বায়ুর বহমানতা, স্বাস্থ্যকর পানীয় জলসহ তখন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে বাঙালির একমাত্র ভ্রমণস্থল। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ রাতে কিংবা বসন্তের কোকিলের সুরে, সেই সবুজ সাম্রাজ্য ছিল এক বাস্তবের নন্দনভূমি। প্রকৃতির নিসর্গ স্পর্শে ঈশ্বরচন্দ্র নন্দিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন নন্দন-নিকেতনের নর-নারীদের সান্নিধ্যে। বিদ্যাসাগর বারবার কলকাতা ফিরেছিলেন, কিন্তু আবার বারবার সাঁওতালদের স্বর্গে ফিরে ফিরে এসেছিলেন। সুবিধাবাদী নিন্দুক শহর থেকে বিদ্যাসাগরকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল সাঁওতালদের সবুজ পৃথিবী।

কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালরা দয়ারসাগরকে ভয় করত না। তাঁকে তারা ভালবাসত অন্তর দিয়ে। তাঁকে ভক্তিতে ভরিয়ে দিত তাঁর পদযুগল। দয়ার সাগরকে ওরা যখনই ডাকত তিনি চলে যেতেন দূরের সাঁওতালপল্লিতে। অসুস্থ সাঁওতালদের দেখতে এবং চিকিৎসা করতে সোজা হেঁটে যেতেন উঁচু-নিচু টিলা, টাঁড় উপেক্ষা করে। জুতো অচল হলেও খালি পায়ে হাঁটতেন। তাঁর সঙ্গী কেউ থাকলে, তাকে কারুণাসাগরের সঙ্গে ছুটতে হতো। শুধু রোগী বা রোগিণীকে ঔষধ দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। সারাদিন সাঁওতাল গৃহে থেকে সেবা করে রাত্রে নন্দনকাননে ফিরতেন। তিনি তাদের হয়ে উঠেছিলেন আত্মার আত্মীয়, প্রাণের ঠাকুর ও দুঃখের দেবতা। দয়ারসাগরের ' নন্দনকাননের' ১১ টি ঘরেরমধ্যে ৩ টি ঘর ছিল সাঁওতাল রোগীদের জন্য নির্ধারিত। দূর-দূরান্তের সাঁওতাল পল্লি থেকে এসে ফিরতে না পারলে, তারা 'নন্দনকাননে' থাকত। তিনি দূরের মেথরপল্লিতে সারারাত বসে কলেরা রোগীর চিকৎসা করেছেন। শুধু চিকৎসা নয় সেবা-শুশ্রূষা করে সাঁওতালদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। আর্তের সেবার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন দাতব্য চিকিৎসালয়। ইন্দ্র মিত্র লিখছেন,"পরোপকার বিদ্যাসাগরের পরম ধর্ম। কেবল নিজের পরোপকার করেই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হননি, অন্যকেও পরোপকারী কবে তুলতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছেন।"[৪]

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবৈতনিক বিদ্যালয়। বিশেষ কবে সাঁওতাল মেয়েদের তিনি নিয়মিত পড়াতেন। আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজদের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতায় 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করে দেন যে ভারতীয়রাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাব্যবস্থার সেই প্রসার সাঁওতালপল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন। ' মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'-এর পাশাপাশি কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের মধ্যে অবৈতনিক ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে অনন্য নজির গড়েছিলেন নিজের অজান্তেই। সেই সঙ্গে অবিভক্ত বিহারে প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রবর্তন করার গৌরব ডাক্তার বিদ্যাসাগরের ওপর বর্তাবে। ক্যাপ্টেন দিলিপ সিনহা লিখেছেন, "He not only live with soutals of karmataud, but

tried to to up lift their social structure. He started the first formal school for Santal girls, possibly the first girl's school of our country.''[৫]

সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁড় পর্বের ১৮ বছরের অজানা কাহিনী বিদ্যাসাগর চরিত্রকে অনেক নতুন তথ্যে ভরিয়ে দিয়েছে। জানা বিদ্যাসাগর এবং অজানা মহাসাগর কে সম্পূর্নভাবে জানতে কার্মাটাঁড়-এর কর্ম জীবন ভালো করে বুঝতে হবে। যেতে হবে সেই সবুজ পৃথিবীর সন্ধানে, যেখানে মহাসাগরের মহান কর্মযজ্ঞের অচেনা জীবন অজানা থেকে গেছে। শেষ করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, "সেইজন্য-বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন, এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিলনা। এ দেশে তাঁহার সমযোগ্য-সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।"[৬]

সূত্র নির্দেশ

১. কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর, পৃ. ২২
২. ঈশ্বরের অন্তিম শ্বাস, পৃ. ২৪
৩. বিদ্যাসাগর ও সাঁওতাল জনজাতি, পৃ. ১৩৬
৪. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃ. ৬৩৫
৫. দ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পীতম ভাট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ১৩৬
৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮২

তথ্যঋণ

১. বিদ্যাসাগর রচনাবলী- প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যম্, কলকাতা-৭৩, ২০০৬
২. বিদ্যাসাগর-রাচানাসম্ভার, সম্পা. প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৭৬
৩. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্র মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৪
৪. দ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পা. পীতম ভট্টাচার্য, সাহিত্যম, কলকাতা- ৯, ২০১৯
৫. বিদ্যাসাগর, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, ষষ্ঠ সংস্করণ-২০১৪
৬. বিদ্যাসাগর: একুশ শতকের চোখে, সম্পা. পল্লব সেনগুপ্ত ও অমিতা চক্রবর্তী, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-১৬, ২০০৩
৭. বিদ্যাসাগর, সঞ্জীব চট্টপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০২০
৮. ঈশ্বরের অন্তিম শ্বাস, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা-০৬, ২০২৩
৯. জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর, সম্পা-দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ২৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২১
১০. বিদ্যাসাগর: নানা প্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, ২০১১
১১. রবীন্দ্র-রচনাবালী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০৯